ধারাবাহিক রচনা

সৎসঙ্গরত্নাবলি

স্বামী ধীরেশানন্দ

[শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজের 'সৎসঙ্গরত্নাবলি' নামে সংকলনটি 'নিবোধত' পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ। উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন উচ্চকোটির সাধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের উচ্চ চিন্তারাজি এই সংকলনের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সংখ্যায় কনখলের মহাত্মা স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের উপদেশাবলি সংকলিত হয়েছে।]

দুটিই মিথ্যা

বশিষ্ঠজী রামচন্দ্রকে বলিলেন, ''জগৎ কোনও কালেই নেই।'' রাম ভাবিলেন, ''জগৎ কেমন নেই দেখব। কাল মত্ত হস্তী গুরুজীর দিকে চালিয়ে দেব।'' পরদিন বশিষ্ঠজী নদীতে স্নানাদি সারিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, হঠাৎ রব উঠিল—''পাগলা হাতি আসছে; পালাও পালাও।'' বশিষ্ঠজীও ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইলেন। পরদিন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনি বলেন জগৎ নেই, তবে হাতি দেখে পালালেন কেন?'' বশিষ্ঠ বলিলেন, ''হাতিও যেমন মিথ্যা, আমার পালিয়ে যাওয়াটাও তেমনি মিথ্যা।''

স্বরূপানন্দ ও বিষয়ানন্দ

অন্তঃকরণ বা অবিদ্যাতে যে-আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয় তাহা স্বরূপানন্দ (বিবরণকারের প্রতিবিম্ববাদ)।

অন্তঃকরণবৃত্তি ও অবিদ্যাবৃত্তিতে যে-আনন্দ প্রতিবিম্বিত তাহা বিষয়ানন্দ। বৃত্তির অনিত্যতাবশতঃ বিষয়ানন্দ অনিত্য।

'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'

এখানে 'সহজং' পদের অর্থ কী? সহ-জ, এক অর্থ এই যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ মানসিক সংস্কার মানুষ লইয়া আসে তদনুরূপ কর্ম। এ-অর্থ পৃথিবীর সকলের পক্ষেই খাটে। এটি সার্বজনীন।

দ্বিতীয় অর্থ, উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়। সেই সংস্কার দ্বারা নির্ধারিত যে-কর্তব্য শাস্ত্র বিধান করেন তাহা দোষযুক্ত মনে হইলেও ত্যাগ করিবে না। এই অর্থ ত্রৈবর্ণিকদের জন্য।

সম্প্রসাদ অবস্থার বোধই শুদ্ধবোধ

গুরু গ্রন্থসাহিবে আছে :

''ন রূপ ন রেখ ন রঙ্গ কছু,
তিহু গুণ সে প্রভু ভিন্ন।
তিসহী বুঝায়ে নানকা, জিসু হোবে সুপ্রসন্ন॥''

সাধারণতঃ লোকে ইহার অর্থ এরূপ করিয়া থাকে যে—প্রভু অর্থাৎ পরমাত্মার রূপ, আকার, বর্ণ কিছুই নাই ও তিনি তিনগুণের অতীত। গুরু নানক

বলিতেছেন যে সেই ব্যক্তিই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে যাহার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন হন অর্থাৎ কৃপা করেন।

কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। শ্লোকের প্রথম দুই পাদে শুদ্ধ পরমাত্ম বস্তুর বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা যথার্থ। শেষের দুই পাদের অর্থ এইরূপ—নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই ওই রূপাদিবিহীন পরমাত্মবস্তু বুঝিতে পারে যাহার সুপ্রসন্ন অর্থাৎ সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার অনুভব হইয়াছে।

জাগ্রতেই সুষুপ্তি অবস্থার অনুভব করতে হইবে। তবেই হইবে পরমাত্মানুভব। সর্ববিশেষরহিত সুষুপ্তির স্মরণে বোঝা যায় যে শুদ্ধ নিজ স্বরূপে রূপ, আকার, বর্ণাদি কিছুই নাই। সুষুপ্তি অবস্থার স্মরণ কীরূপ? সুষুপ্তিতে তুমি কালো, গোরা, ছোট, বড় কী ছিলে তাহা কিছু বলিতে পার কি? পার না, কারণ তখন তোমাতে কিছুই নাই। তেমন জাগ্রতেও তোমাতে এসব কিছুই নাই। এগুলি সব আগন্তুক, কল্পিত—মিথ্যা। নাই কোনওকালে, শুধু মিথ্যা প্রতীতি। তাই জাগ্রতে যখন ওই সুষুপ্তির অনুভব হইবে অর্থাৎ সর্বদৃশ্যাভাব হইবে তখনই শুদ্ধ পরমাত্মবোধ হইবে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

সুষুপ্তি, সমাধি—জ্ঞানী, অজ্ঞানীর সমান। অবস্থাতে কোনও ভেদ নাই। যদি বল সংস্কারে ভেদ রহিয়াছে, জ্ঞানীর জ্ঞানের সংস্কার আর অজ্ঞানীর অজ্ঞানের সংস্কার ভিন্ন বলিয়া অবস্থাও ভিন্ন হইবে, তাহা হইতে পারে না। কারণ তৎকালে সংস্কার অনুদ্বুদ্ধ। সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে তবেই তাহা দ্বারা অবস্থার ভেদ হয়। অনুদ্বুদ্ধ সংস্কার দ্বারা কোনও ভেদ হয় না।

দুঃখই বিচারের ভাল মশলা

আমার পা কতটা ফুলেছে তাই দেখছ? না, চামড়ার দিকে দেখো না। চামড়ার উপর নজর কেন? নজর দাও সত্যবস্তুর দিকে। মিথ্যা পদার্থের পরিণাম হচ্ছে ও হবেই, সেজন্য চিন্তা কী? বস্তুতে পরিণাম নেই। যেমন, ঠিক তেমনই আছে সর্বদা।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার স্বস্বরূপে এত দৃঢ় নিষ্ঠা হল কী করে? এ কি কেবল বেদান্তবিচার দ্বারাই, অথবা ধারণা ধ্যান সমাধির অভ্যাস দ্বারাই হয়েছে?

উত্তর : বিচারমার্গই উৎকৃষ্ট। আরও দেখো, দুঃখ-কষ্টের সময়ই বিচার আরও ভাল হয়। বিচারের মশলা ভাল পাওয়া যায় তখন। সুখের সময় ভাল বিচার হয় না।

প্রশ্ন : তা ঠিক। তবে যতদিন শরীর আছে, রোগ হলে কিছু প্রতিকারের চেষ্টাও তো করতে হয়?

উত্তর : তোমাকে তো আমি বারবার বলি যে কর্তব্য অভিমান ছাড়ো। এটা করা উচিত, এটা করা দরকার—এসব অভিমান ত্যাগ না করলে কিছু হবে না। বরং বলো—যা হয়ে যায়। 'ইয়ে সব হোতা রহতা হ্যায়।' দ্রষ্টারূপে দেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শরীরে কী হল না হল এসবে বিশেষ অভিনিবেশ করাটাই ভুল। এসব কথা ছাড়ো। বলো, কোনও তত্ত্বকথা বলো। বেদান্তের আলোচনা করো। বেদান্ত বিষয়ে কোনও কথা তোলো। তাতেই আমার আনন্দ। অন্য কথা বা শরীরের কথা তুললে আমার মনে বিরক্তি আসে, তুমি তো তা জানই। কোনও উত্তম বিচারের প্রসঙ্গ তোলো।

দেখো, তোমাকে একটি খাঁটি কথা বলছি—বেদান্তের কোনও সিদ্ধান্ত নেই। বস্তু বাক্যমনের অগোচর। কোনও বাণী দ্বারাই তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। বস্তুকে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলে তাও অতদ্‌ব্যাবৃত্তির জন্য। অসত্তার নিষেধের জন্য সৎ, জড়ত্বের নিষেধের জন্য চিৎ আর দুঃখব্যাবৃত্তির জন্যই তাঁকে আনন্দস্বরূপ বলা হয় মাত্র।

প্রণামে দ্বিধাভাব

দণ্ডীরা দণ্ড লইয়া বেড়ায়। তাহারা কোনও দেবতার নিকটেও মাথা নত করে না। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়াও ওই দণ্ডটি শিবের মাথায়

ছোঁয়ায়। নিজেরা মাথা নত করিয়া প্রণাম করে না। এর রহস্য কী? জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, শিবলিঙ্গে মাথা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে লিঙ্গ ফাটিয়া যাইবে। কেন ফাটিয়া যাইবে তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করে না। মাথা দিয়া জোরে আঘাত করিলেও তো পাথর ফাটিবে না, বরং মাথাই ফাটিয়া যাইবে। এই সহজ কথাটাও কি কেহ জানে না? তবে ওই পাথর ফাটিয়া যাইবে কথার মানে কী?

কথাটি তাহারা ঠিকই বলে। বোধ হয় কোনও প্রমাণশ্লোকও আছে এ বিষয়ে। কথাটি হইতেছে—ফাটিয়া যাইবে অর্থাৎ দ্বিধাভাব প্রাপ্ত হইবে বা দুই হইয়া যাইবে। সন্ন্যাসী অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সর্বদা মন লীন করিয়া রাখেন অর্থাৎ তাঁহার তাহাই কর্তব্য। এখন প্রণাম করিতে দুইটি দরকার। দ্বৈতভাব অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকভাব ছাড়া প্রণাম অসম্ভব। দ্বৈতভাব যাহাতে না আসে সেজন্য তাহারা মাথা নত করিয়া প্রণাম করে না, কেবল ওই দণ্ডটি স্পর্শ করায়। ভাবের দিক দিয়া কথাটি বেশ।

একজন মুসলমান সুফি কবি বলিয়াছেন,

''সিজদাতেঁ গর মিলে জন্নৎ দূর কীজিয়ে।
দোজকহী সহী শিরকা ঝুকানা নহী আচ্ছা॥''

'সিজদা' হইল নমাজের সময় বারবার মাথা মাটিতে স্পর্শ করা। গর—অগর, যদি। জন্নৎ—স্বর্গ। দোজক—নরক। সহী—ভাল, ঠিক।

অর্থাৎ প্রার্থনার সময় বারবার ভূমিতে মাথা নত করিলেই যদি স্বর্গ লাভ হয় তো ওইরূপ স্বর্গও বাঞ্ছনীয় নহে, উহা দূর করো। নরকই আসুক, তাহাও সই, তবু মাথা কাহারও নিকট নত করা ঠিক নহে, সে ভগবানই হউক অথবা অন্য যেকোনও ব্যক্তিই হউক।

মাথা নত করিয়া দীনতা প্রকাশ করিব কেন? বস্তু যখন আমা হইতে ভিন্ন নয়, তখন স্বস্বরূপে স্থিতিই তো আমার কাম্য। ব্যহ্য ভেদদৃষ্টির অবসর মনকে কেন দিব?

শতং জীব

লোকে আশীর্বাদ করে—'শতং জীব' অর্থাৎ 'দীর্ঘায়ু হও' ইত্যাদি। কী মূর্খতা! দীর্ঘায়ু হইয়া এইরূপ বৃদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকা! যত বেশি আয়ু হইবে ততই তো এইরূপ শরীর লইয়া চলিতে হইবে? এর চেয়ে দুর্ভাগ্য, কষ্ট আর কী হইতে পারে? তবু লোকে দীর্ঘায়ু চায়। বাঁচিয়া থাকিতে চায়।—এইরূপ বিচার আসিলে অন্তত বৃদ্ধাবস্থাতেও শরীরের প্রতি বৈরাগ্য আসিবে। বিচারবানেরই হইবে, অপরের নহে। শাস্ত্রেরও ইহাই উদ্দেশ্য। তাই শাস্ত্র বলেন—'জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' বৈরাগ্যের জন্যই শাস্ত্র ইহা বলিয়াছেন। যদি আগে বৈরাগ্য না হয় তো বৃদ্ধাবস্থায় দুঃখে পড়িয়া হইবে। নতুবা বৃদ্ধ হইয়া দুঃখ পাওয়ার জন্য কি আর কেউ আশীর্বাদ করে?

আমি কে

ভিক্ষু—(একটি নবাগত যুবককে)—বলো কী জন্য এসেছ?

যুবক—আপনার কাছে কিছু শুনতে এসেছি।

ভিক্ষু—কী শুনতে চাও? বৈদ্য নাড়ি দেখে ঔষধ দেয়। এক্ষেত্রে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে নাড়ি দেখা। প্রশ্ন করলে তবে তো বুঝব তুমি কীসের খদ্দের, কী চাও। খিদে পেলে তবে তাকে অন্ন দিতে হয়।

যুবক—বলুন, আমি কে?

ভিক্ষু—তুমি সাক্ষাৎ সামনে বসে আছ আর তুমি নিজেই জিজ্ঞাসা করছ তুমি কে? এ কি আশ্চর্য নয়? এ লজ্জার কথা। তুমি কে তা তুমি নিজে বলতে না পারলে অপরে কী করে বলবে? তোমার মুখে গুড়, অপরে তার স্বাদ কখনও বলতে পারে, তুমি ছাড়া? অতএব তুমি কী নও তাই মাত্র বলা যায়। তুমি কী তা তুমি নিজে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। সর্বশাস্ত্রও কেবল তুমি কী নও, তাই বলে। তুমি শরীর নও, মন নও, বুদ্ধি নও, বাণী নও ইত্যাদি বলে। তুমি মন-বাণীর অবিষয়। সুষুপ্তিকালে

তুমি থাক। তুমি তখন কালো, ফরসা, লম্বা, বেঁটে বা কেমন—তা বলতে পার কি? পার না। অন্য অবস্থায় যখন মন ভেসে ওঠে তখন দেহেন্দ্রিয়াদি প্রতীতি হতে থাকে। এগুলি আসে আবার যায়, কিন্তু তুমি থাক। সেই তো তুমি। নির্বিকল্প সমাধি তো আর সকলের হয় না! কিন্তু সুষুপ্তি সকলেরই হয়। সেই সুষুপ্তি নিয়ে বিচার করো। নিজেকে পেয়ে যাবে। হাজার বলে বলে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ বলতে পারে না সে কে। বুঝলে ব্যাপার?

সতের জঞ্জাল ছাড়ো

কথার ফাঁদে পড়িয়ো না। কবিরা কথার জাল বুনিয়া বুনিয়া নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ও লোকে তাহাতে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। মনে করে এইটিই সত্য, আর সব বাজে। কত থিয়োরি! বিভিন্ন মতবাদে অশান্তিপূর্ণ জগৎ আরও কোলাহলময় হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলে বাইবেলে এরূপ বলিয়াছে ইহাই ঠিক, কেহ বলে আমার কোরাণ শরিফে এরূপ বলিয়াছে, উহাই ঠিক। আবার হিন্দুরা বলে আমাদের বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের কথাই ঠিক। কারটা মানিবে? সবই তো বিভিন্ন মনুষ্যের রচনা, কল্পনা। জন্মান্তরবাদ দেখো। কেহ জন্মান্তর মানে। এটিই যদি বাস্তব সত্য হয় তবে যাহারা জন্মান্তর মানে না, যেমন মুসলমান, খ্রিস্টান ও নাস্তিক চার্বাকরা—তাহাদের মৃত্যুর পর কী হয়? মৃত্যুর পর কী হয় কেহ জানে না। আপন আপন মত লইয়া সব ঝগড়া করিয়া মরে। সুষুপ্তিতে কী থাকে কেহ বলিতে পারে না। সমাধিতে কী থাকে তাহাও ভাষা দ্বারা কেহ বলিতে পারে না। বিদেহমুক্তির কথাও তদ্রূপ। কী থাকে, কী অনুভব, তাহা তো আর কেহ আসিয়া বলে নাই? এই তিন অবস্থাই একরূপ। যাহা থাকে তাহাই আমি, আর তাহা শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। সেই আমাতেই জাগ্রত-স্বপ্নে জগৎ ভাসিতেছে। কী অদ্ভুত খেলা দেখো! জগৎ এক জাদুঘর। সব বস্তু এখানে কেবল দেখিয়া যাও। জাদুঘরে দেখো নাই, লেখা থাকে? ''কোনও জিনিস স্পর্শ করা নিষেধ।'' জগৎরূপ জাদুঘরেও সব জিনিস দেখিয়া আনন্দ করার জন্য। ছুঁইয়ো না, অর্থাৎ 'অহং-মম' অভিমান করিয়ো না। অভিমান করিলেই ফাঁদে পড়িবে। জাদুঘরের কোনও জিনিস স্পর্শ করিলে পাহারাদার তোমাকে ঘর হইতে বার করিয়া দিবে। সুষুপ্তি আদি অবস্থাতে কোনও দুঃখ নাই কারণ তখন জগৎ নাই, দ্বৈত নাই। এই দুঃখনিবৃত্তিকেই পরমানন্দ বলে। নতুবা কি সেখানে টুকরিভর্তি আনন্দ কেহ রাখিয়া দিয়াছে নাকি? বেদান্তীরা বলে ব্রহ্ম। কল্পনা ছাড়ো, তবেই বাক্য-মনের অবিষয় নিজেকে পাইয়া যাইবে। মনের যেকোনও স্ফুরণ, উহাই কল্পনা—উহাই তোমার স্বরূপে পরিচ্ছেদ আনিতেছে। ঈশ্বরচিন্তনই বলো, ইহলোক পরলোক বিষয়েই বলো বা কর্মবাদ—কিছু চিন্তা করাটাই একটা কল্পনা, তোমার স্বরূপের উপরে যেন একটা আবরণ। তুমি তো এইসবের কোনওটাই নহ। তাই বলি, শোনো—

''ভলেভয়ো কি হর বিসরো, শিরকী গয়ী বলা।
অব জ্যায়সে কী ত্যায়সে রহা,
অব কুছ কহা ন জায়।''

—শিব অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তনও আমার বিস্মরণ হইয়াছে—ভালই হইয়াছে। মাথা হইতে একটা কল্পনার বোঝা যেন নামিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরচিন্তন হইতেও মুক্ত হইয়া আমি এখন যেমন ঠিক তেমনই আছি। ইহা বিষয়ে শব্দ দ্বারা আর কিছু প্রকাশ করা যায় না।

''জো কুছ শিখা থা উস্তাদ্‌কা আগে।
বহ সব ভুল গয়া এক ইয়ারকা আগে॥''

—যা কিছু বিদ্যা, প্রক্রিয়া, মতবাদ গুরুর নিকট শিখিয়াছি তাহা সব এখন এক অদ্বিতীয় স্বস্বরূপের উপলব্ধির প্রভাবে যেন হাওয়ায় বিলীন হইয়া গেল অর্থাৎ সেইসব মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি। *(ক্রমশ)*